

স ম জ

আবুল মোমেন

আমাদের দেশে শিশুমাত্রই উপেক্ষিত, সুস্থ শৈশব থেকে তারা বঞ্চিত। হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের শিশুর বঞ্চনার বাস্তবতা আমরা জানি, কিন্তু ধনীরা সন্তানও কি আদর্শ শৈশব কাটাতে পারে? তাদের হয়তো ভোগ-আস্বাদনের সুযোগ সীমাহীন, কিন্তু শিশুর আনন্দের প্রধান উৎস তো অংশগ্রহণমূলক কাজে (বা খেলায়)। সেখানে অধিকাংশের জীবনই কাটে বন্দিদশায়, একাকিত্বে। সচরাচর শিশু খেলনার অপেক্ষায় থাকে না, কিন্তু খেলনা পেতে নিশ্চয় তার ভালো লাগে। অনেক বাবা-মা শিশুর এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে খেলার বদলে তাকে খেলনার প্রলোভন দেখিয়ে তার কাছ থেকে শৃঙ্খলা আদায় করেন (চুপ করে বসে থাকা, দ্রুত খাওয়া ইত্যাদি)। বড়রা শিশুর 'দুর্বলতা'কে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে নিজের কার্যসিদ্ধি করলেও পরিণামে শিশুর মধ্যে কান্ডাকৃত জিনিস আদায়ের দর-কষাকষির মনোবৃত্তি উসকে তোলেন। তাতে সম্পর্কের সারল্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা চোটে খায়, এর মধ্যে উভয় পক্ষে চালাকির প্রবণতা ঢুকতে থাকে।

শিশুর মনোজগৎ সরল বলেই সং, সত্যতার সারল্যেই ফোটে তার সৌন্দর্য। তুলনায় বড়দের জগৎ অনেক জটিল এবং বিস্তারিত কৌশল, বহুতর দায়, বিচিত্র সব ভাবনা এবং নানা বিবেচনার প্রভাবে সেটা নিছক সাদা-কালোয় তৈরি নয়। সে জন্য শিশুর সঙ্গে চলা ও খেলার সময় বড়দের একটা সতর্ক অর্থাৎ বাড়তি বিবেচনা মাথায় রাখতে হবে। বাঙালি সমাজ তা করে না। বাঙালি সমাজমানসের কিছু মজাগত বৈশিষ্ট্য আছে, যা শিশুর সৃষ্টি বিকাশের জন্য নেতিবাচক। যেমন সমাজটা কপটতায় অভ্যস্ত, নৈতিক মূল্যবোধের বিষয়ে উদাসীন (সুখে খুব বলে, কিন্তু আচরণে সম্পূর্ণ উদাসীন), এ সমাজ পক্ষপাতদুষ্ট, সহজাত ঔদার্য ও সহিষ্ণুতার শক্তি হারিয়ে ফেলছে। শিশুর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা সম্প্রতি দেখেছি।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে ভুলে যাই যে শিশু এমন এক অসীম সম্ভাবনাময় পাত্র যার আধেয়সমূহ কেবল সরল নয়, কাঁচা, সুস্থ, উন্মুক্ত অর্থাৎ গ্রহণ ও বিকাশের জন্য হনো হয়ে আছে। এ সময় তার নিজের বিচারক্ষমতা দুর্বল, দূরদর্শিতাও তার কাছে কাম্য হতে পারে না। কিন্তু হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে শিশু যদি কেবল সঠিক জিনিস পায়, ন্যায্য কথাটাই শুনতে পায় তাহলে বিচারবোধ, দূরদর্শিতাসহ তার সব দক্ষতা ও মূল্যবোধই বিকশিত হবে।

সেটাই পথ, সেই পথে চলার আয়োজনটাই জরুরি। হয়তো এখান থেকে আমরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক সৃষ্টি বিকাশের মানবিক স্বর্গীয় বাস্তবতা তৈরি করা সম্ভব (যা বাস্তবে ঘটেছিল) তার কথা টানতে পারি। কিন্তু সে আলোচনা শিশুর বিকাশের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে রাজনৈতিক দিকেই মোড় নেবে। আজকে আমরা সেদিকে যাব না।

আমাদের ধারণা, বর্তমান বাস্তবতায়ও শিশুর বিকাশে কান্ডাকৃত ফল পাওয়া সম্ভব। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের চ্যালেঞ্জটাও আমাদের জন্য কম বড় ছিল না। সীমাবদ্ধ জমি ও পুঁজির স্বল্পতার বিপরীতে ক্রমবর্ধমান মানুষের

যে চ্যালেঞ্জ তা আমরা ভালোভাবে উতরেছি। কেবল যে চালে উদ্বৃত্ত হয়েছি তা নয়, সবজি, মাছ, ফলেও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছি। এ বিপ্লব ঘটেছে নিজেদের অর্থায়নে, পরিশ্রমে, দক্ষতায় ও প্রযুক্তির ব্যবহারে। কৃষিবিপ্লবের মতোই শিক্ষাবিপ্লব দরকার।

খাদ্যের চাহিদা যেহেতু জৈবিক তাই প্রাণীমাত্রই তা বোঝে। জ্ঞান খাদ্যের মতো বস্তু নয়, বিমূর্ত বিষয়, এর পরিমাপের ব্যবস্থাটি কৃত্রিম, জ্ঞানের নিজস্ব প্রকৃতি হলো এর অব্যাহত বিকাশ। তাই জ্ঞান হলো চর্চার বিষয়, এর উদ্ভাবন নবায়ন, নিত্য পরিমার্জন অপরিহার্য। এর নিছক চর্চার আনন্দই হলো মৌলিক, তা যদি পরীক্ষার ফলের অর্থাৎ পরিমাপের কৃত্রিম ব্যবস্থার ফাঁদে আটকে পড়ে তবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে সমাজকে, এটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ হয়ে উঠছে না। জ্ঞানের বিচারে এ সমাজ অনেকাংশে তামাদি অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ বেশির ভাগ বিষয়ে পুরোনো ধ্যানধারণা, বিশ্বাস আঁকড়ে আছে। সর্বোচ্চ ভিত্তি নিলেও এটিই বাস্তবতা। জ্ঞান হলো অসীম এবং জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হবে নানা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে প্রাণবন্ত, মুক্ত, বিকাশমান। কিন্তু আমাদের সমাজমানসে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এখনো দৃঢ়মূল গুণু নয়, যেটুকু জ্ঞানচর্চা হয় তা পদ্ধতির কারণে কার্যত বিশ্বাসে, কখনো অন্ধবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়। এভাবে বলা যায়, সমাজটা অনুসন্ধিৎসায়, যুক্তিতে তথা জ্ঞানের অজানা নতুন পথে দুঃসাহসী অভিযানের জন্য একেবারেই প্রস্তুত নয়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও তাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও সমাজ বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার অনুকূল নয়। আর নয় বলেই এখানে যেকোনো স্তর থেকে যেকোনো শিক্ষার্থী যেকোনো অন্ধবিশ্বাসে দীক্ষিত হতে পারে। ধর্মীয় চরম পন্থা, যা সম্প্রতি

জঙ্গিবাদে প্রকাশ পাচ্ছে তার প্রচারণাকে প্রতিরোধের মতো পাল্টা যুক্তি-ভাবনা বর্তমান বিদ্যায় কুলাবে না।

জ্ঞানের দিক থেকে এটি স্থির এবং যেহেতু স্থিরতা প্রাণজ বস্তুকে পচন ও ক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, তাই এ সমাজের অবস্থাও সে রকমই হচ্ছে। দালালকোঠা নির্মাণকেই গুরুত্ব দিচ্ছি; আরাম ও ভোগ, বিলাস ও বিনোদন গুরুত্ব পাচ্ছে। প্রাণের বিকাশ, জ্ঞানের আনন্দ মোটেও পাত্তা পাচ্ছে না। এটা সংস্কৃতির সংকট, যা শিশুকাল থেকেই শিক্ষার মাধ্যমে পাওয়ার কথা।

শিক্ষার একটা সংস্কৃতি আছে, যেমন সব বিষয়ের থাকে। শিক্ষার সংস্কৃতির নিহিত চাহিদা হলো মুক্ত পরিবেশ, অংশগ্রহণের অবাধ সুযোগ, প্রকাশের স্বাধীনতা।

তাই স্কুল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ভাবলে তার অনুকূল সাংস্কৃতিক পরিবেশও নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য শিক্ষার দুটি দিক নিয়ে ভাবা জরুরি

১. প্রশ্নের উত্তর-নির্ভর পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার স্থলে জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা (বাংলা ও ইংরেজি) ও গণিতে দক্ষতা ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন হবে শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

২. সেই লক্ষ্য অর্জনে সাফল্যের জন্য চাই জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আত্মপরিচয়ের শিকড়ের সঙ্গে শিশুমনের সংযোগ ঘটা। সে লক্ষ্যে চাই

ক. দেশ ও জনগোষ্ঠীর ইতিহাস-জ্ঞান, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস, মানুষের অর্জন ও অবদান সম্পর্কে ধারণা।

খ. নিজের দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় এবং বিশ্বসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা।

গ. সৃজনশীলতার চর্চা এবং নিজের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাচর্চা ও এসবের রসাস্বাদনের দক্ষতা অর্জন।

ঘ. চর্চার মাধ্যমে যুক্তি, বিচার-বিবেচনা, বিশ্লেষণের, সক্ষমতা অর্জন।

ঙ. মানবিক গুণাবলি এবং নাগরিকের অধিকার, দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।

সবিনয় বলব, দ্বিতীয় ধারার কাজকে সহশিক্ষামূলক কাজ বলে দূরে ঠেলে রাখলে চলবে না। এসব শিক্ষার প্রাথমিক বিষয় নয়, শিক্ষার অনুষঙ্গ নয়, প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং জরুরি ও অন্তর্গত বিষয়। এ পর্যায়ে শিশুরা দল বেঁধে নানা-কাজে অংশগ্রহণ করবে, যেমন: খেলা, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান প্রকল্প, দেয়াল পত্রিকা, প্রকৃতিপাঠ, বিতর্ক ইত্যাদি। এসব চর্চা হলে শিক্ষার সংস্কৃতি ধীরে ধীরে অর্জিত হবে। লক্ষ্য ঠিক থাকলে কাজ বাস্তবায়ন অসম্ভব নয়। কৃষক যদি দ্বিগুণ ও ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগান দিয়ে যেতে পারেন, তাহলে শিক্ষিত তরুণেরা মিলে কেন পারবেন না শিক্ষার গুণগত রূপান্তর ঘটাতে?

আমরা জানি, ঠিক যেমন জমির স্বল্পতার বিপরীতে জনসংখ্যার অধিকা ছিল বড় সংকট, তেমনি শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মানসম্পন্ন শিক্ষকের রয়েছে সংকট। আমরা বুঝি রাতারাতি পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তবে শিক্ষাকে কৃষির সঙ্গে সবটা মেলানো না গেলেও একফসলি জমিকে যেমন তিনফসলা করা গেছে, তেমনি এক স্কুলকে তিন শিফটে চালানো যায়, দুটি শিফটে নিয়মিত লেখাপড়া হবে আর বিকেল-সন্ধ্যার শিফটে সংস্কৃতির পাঠ চলবে। সংস্কৃতি শব্দটা এখানে আমরা এর ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করছি, যা মানুষের মন-মানসিকতা, রুচি, নীতিবোধ উন্নত করে জীবনকে আলোকিত করবে।

এ পাঠ হয়তো শিক্ষকেরা দিতে পারবেন না। এর জন্য প্রয়োজন হবে শিক্ষাকর্মীর। আমরা নেন ভুলে না যাই, যাঁদের দশকে ছাত্রকর্মী, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনৈতিক কর্মীরাই ছিলেন পরিবর্তনের মূল শক্তি। আজ যদি উন্নত দেশ গঠনে শিক্ষিত জাতির প্রয়োজনে শিক্ষায় বিপ্লব ঘটাতে হয়, তবে চাই উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক দক্ষ শিক্ষাকর্মীর দল। তারা হবে পরিবর্তনের কারিগর ও রূপকার। আর এই সংস্কৃতি পাঠের জন্য আমাদের থাকবে কর্মপরিকল্পনা, পাঠক্রম ও পুস্তিকাসহ উপকরণ।

এভাবে চর্চার উপকার এই যে, শিশুর মন ও মনন অনেক রকম বিষয় ও শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তা উপভোগের জন্য তৈরি হতে থাকবে। বড় হতে হতে তাদের মানসে অনেক অবলম্বন তৈরি হবে ভেতর-বাইরের কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও প্রলোভন প্রতিরোধের জন্য। মৌলবাদ, মাদকের হাতছানি প্রতিরোধে কিংবা যৌবনের উন্মেষকালে মানবজীবনের বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কাজটিও তাদের জন্য অনেক সহজ হবে। শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতির পাঠ যুক্ত হলে এভাবে মানুষ তার জৈব তাড়না ও মনের অন্ধ সংস্কারের জাল ছিন্ন করার মতো আলোর অন্ত্র হাতে পায়।

তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই শিক্ষায় সাংস্কৃতিক পাঠের বিষয় অন্তর্ভুক্তির কথা জরুরি ভিত্তিতে ভাবতে হবে।

সরকার শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর চিন্তাভাবনাও চলছে। আমরা আশা করব, বর্তমান বাজেটে অন্তত ইউনিসেফ-নির্ধারিত জিডিপি ২০ শতাংশ এবং বার্ষিক বাজেটের ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হবে। এর বাইরে আশা করি সরকারি অর্থায়নে এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার সহায়তায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে আরও প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

● আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

